## ২
# প্রহসন ও ট্র্যাজেডি

১৩ই এপ্রিল সন্ধ্যায় পাকিস্তান আর্মি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করার ফলে স্বাভাবিকভাবে আমরা হট্টগোল থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। এর আগে প্রতিদিন যেমন কখন কোন দল এসে গুলি-গোলা ছুঁড়তে শুরু করবে সেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকতাম, সেই আতঙ্ক হ্রাস পেলো এবং সামগ্রিকভাবে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাববার অবকাশ পেলাম। আশ্চর্য পূর্ব পাকিস্তানের কোথায় কি ঘটছে তার সঠিক বিবরণ রাজশাহীতে আগত বাহিনীর জানা ছিল না। এক মেজর একদিন আমাকে বললেন যে, তাঁরা ইকবাল হল ধ্বংস করতে বাধ্য হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস দিলেন যে, গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা হবে, টাকার অভাব হবে না। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস তথা রাজধানীকে নতুনভাবে গড়ে তোলা হবে। এ আশ্বাসে খুশি হতে পারিনি। তার আরো একটি বড় কারণ দেশে মার্চের পঁচিশ-ছাব্বিশ তারিখে কি ঘটেছিলো সে সম্বন্ধে কোনো প্রামাণ্য তথ্য তাঁদের কাছ থেকে পাইনি। এমন কি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক কয়জন নিহত হয়েছেন তাও তাঁরা ঠিকভাবে বললেন না বা বলতে পারলেন না। আমি শুনেছিলাম যে বাংলা বিভাগের মুনির চৌধুরী নিহত হয়েছেন এবং আরো দশ-বারোজন। কারো নামই পাওয়া গেলো না। আমার উদ্বেগ বৃদ্ধি পেলো।

কর্ণেল তাজ তেরো তারিখের সন্ধ্যায় ক্যাম্পাস দখল করার পর বোধ হয় প্রথমেই বন্দী অবাঙ্গালী শিক্ষকদের মুক্তি দিয়েছিলেন, কারণ পরদিন ভোরবেলা জিয়োগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের ডক্টর প্যাটেল আমার বাসায় এসে বললেন যে, ব্রিগেডিয়ার আরবাব খান আমার সাথে দেখা করবেন। তিনি আমাকে জুবেরি হাউজে নিতে এসেছেন। জুবেরি হাউজে আর্মির অফিসারবৃন্দ তাঁদের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেছিলেন। ডক্টর প্যাটেলকে সঙ্গে নিয়ে কতক্ষণ পর সেখানে গেলাম। আরবাব খান এবং আরো দু'একজন অফিসারের সঙ্গে দেখা হলো। কথাবার্তা বললেন আরবাব খান। মনে হলো, তিনি বেশ শিক্ষিত লোক। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির সম্পর্কে তাঁর মধ্যে অতিরিক্ত আশাবাদ ছিলো না কিন্তু নৈরাশ্যেরও আভাস ছিলো না। তিনি বললেন যে, তাঁরা আশা করেন মে মাসের শেষ অবধি প্রদেশের সর্বত্র আর্মির কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিদ্রোহীদের আগাগোড়া মিসক্রিয়েন্টস বলে আখ্যায়িত করলেন। আরো দুঃখ করে বললেন যে বহু কালের ভুল-বোঝাবুঝির ফলে এই সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। এবং তিনি আশা করেন যে বিদ্রোহীরা সহজেই তাদের ভুল বুঝতে পারবে। পাকিস্তান যে আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সেটা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে এ কথা



তিনি বিশ্বাস করেন না। শেষোক্ত কথাটির সমর্থন করে আমি বললাম যে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে হলে বুদ্ধিমত্তা এবং ধৈর্যের প্রয়োজন হবে। আরবাব খান আমাকে অনুরোধ করলেন যে আমি যেনো বেতার কেন্দ্র থেকে শান্তি ও শৃংখলার জন্য আবেদন জানাই। আলোচনা আমাদের এখানেই শেষ হয়।

বাসায় ফিরে এসে আর এক অদ্ভুত এবং কিছুটা হাস্যকর সমস্যার কথা শুনলাম। ভাইস চান্সেলরের বাসা এবং জুবেরী হাউজের মাঝামাঝি কয়েকটি প্রফেসরস কোয়ার্টারস ছিলো। তার একটায় থাকতেন ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর আহমদ হোসেন। শুনলাম গত সন্ধ্যায় গোলা-গুলির সময় তিনি ছাদে পানির ট্যাঙ্কের নীচে আত্মগোপন করেছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গ অবশ্য নীচে ছিলো। জানি না কি কারণে তাঁর মনে হয়েছিলো যে বিপদ এলে সেটা তাঁর উপরই এসে পড়বে। কিন্তু সকাল বেলা তিনি আর বেরুতে পারছিলেন না। তাঁর ভয় হচ্ছিল তাঁকে ওভাবে ছাদে দেখলে স্নাইপার মনে করে আর্মি তখনই গুলি করবে। জুবেরী হাউজের চারপাশে সৈন্যরা টহল দিচ্ছে, কখন তাদের চোখে পড়বে যে একজন লোক ছাদে বসে আছে ট্যাংকের তলায় তা বলা যাচ্ছিলো না। রাতের অন্ধকারে তিনি নেমে এলেও এই সংকট সৃষ্টি হতো না। কিন্তু অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি নামতেও সাহস পাননি। এখন উপায়? তাঁর ফ্যামিলি আমাকে সাহায্যের জন্য খবর পাঠিয়েছিলেন। আমি স্থির করলাম যে গোপনে ডক্টর আহমদ হোসেনকে ছাদ থেকে নামাবার চেষ্টা করলে বিপদের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাবে। বরঞ্চ খোলাখুলি ব্যাপারটা আর্মিকে বুঝিয়ে বললে একটা সুরাহা হবে। তখন একজন জুনিয়র আর্মি অফিসারকে বললাম যে, আমাদের একজন অধ্যাপক ছাদে ট্যাংকের তলায় আটকে পড়ে গেছেন-বেরুতে পারছেন না। আর্মি লোক পাঠিয়ে তাঁকে নামিয়ে দেয়।

বেলা বোধহয় দশটার মধ্যে আরও এক আর্মি অফিসার এসে আমাকে বললেন যে তাঁদের আরো জায়গার দরকার। যে সমস্ত বাসায় কোনো লোকজন নেই সে রকম দু'একটি বাসা যেনো তাঁদের আমি দিই। তিনি আরো আশ্বাস দিলেন যে আসবাবপত্রের হেফাজত তাঁরা করবেন। বাস্তবিক পক্ষে বাসা অনেকগুলি খালি ছিলো। আমি বললাম যে তাঁরা ইচ্ছামত যে কোন বাসা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু মালপত্রের যেনো কোনো লোকসান না হয়। অফিসারের অনুরোধে চাবিসহ দু'জন দারোয়ানকে তাঁর সঙ্গে দেওয়া হলো। তিনি ওয়াদা করে গেলেন যে এদের তিনি ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন। আমি বললাম যে এদের যেনো কোনো মতেই একা ছেড়ে না দেওয়া হয়। অন্য সৈন্যের হাতে এরা বিপদে পড়তে পারে। অফিসার আশ্বাস দিলেন যে, কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। আমি মনে করেছিলাম যে দারোয়ান দু'জন হয়তো ঘন্টাখানেকের মধ্যেই অফিসারটিকে বাসা দেখিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু বিকেল তিনটে পর্যন্ত তাদের সন্ধান না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। জিজ্ঞাসাবাদ করে শুনলাম ওরা বাসায়ও ফেরেনি। সন্ধ্যার দিকে মেঘ-বৃষ্টি শুরু হলো। আমার উদ্বেগও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। একবার ভাবলাম

যে আবহাওয়া খারাপ দেখে ওরা হয়তো অন্য কোথায়ও রাত কাটাচ্ছিলো। কিন্তু সারারাত দুশ্চিন্তায় ডুবে ছিলাম। সকালেও যখন দারোয়ান দু'জনের দেখা পাওয়া গেলো না; তখন স্থির করলাম যে জুবেরী হাউজে ওদের খোঁজ করবো। কিন্তু বাসার কমপাউন্ড থেকে বের হওয়াও বিপদ। কারণ আর্মি সর্বত্র কার্ফ্যু জারি করে সবাইকে গৃহে আবদ্ধ করে রেখেছিলো, আমরা দু'জন ইবনে আহমদ এবং আমি গেইটে অপেক্ষা করে রইলাম, কোনো জওয়ানের দেখা পাওয়া যায় কি-না সে আশায়। শেষ পর্যন্ত আর্মির এক নাপিত পাওয়া গেল। তাকে বুঝিয়ে বললাম, আমাদের জুবেরী হাউজে যেতে হবে বিশেষ কাজে। সে যেনো আমাদের একটু পৌঁছে দেয়। তাকে সঙ্গে করে জুবেরী হাউজে এসে সে অফিসারের খোঁজ করলাম, নাম জিজ্ঞেস করিনি; শুধু বলতে পারলাম, আমার বাসা থেকে তিনি দু'জন দারোয়ানকে নিয়ে এসেছিলেন। কিছুকাল অপেক্ষার পর সৌভাগ্যক্রমে সে অফিসারটির সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন যে, তিনি নাকি ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ওদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে তারা গেলো কোথায়? আমার শঙ্কা আরো বেড়ে গেলো। অফিসারকে বলে দু'জন জওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করলাম। ওদের নাম ধরে উচ্চৈস্বরে ডাকাডাকি করলাম। কিন্তু কোনোই সাড়া পাওয়া গেলো না। একবার সন্দেহ হলো, ওরা হয় তো এই ফাঁকে ভয়ে ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে গেছে। কিন্তু আবার মনে হলো ক্যাম্পাসের আশ্রয় ছেড়ে যাবেই বা কেনো। উপস্থিত আর কিছু করার ছিলো না। দারোয়ান দু'জনের নাম জওয়ানদের জানিয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম ওরা যেনো তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

এ রহস্যের একটা মর্মান্তিক সমাধান পাওয়া গেলো। সাত-আট দিন পর। অন্য এক দারোয়ান এসে খবর দিলো যে এক বাসা থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠানো হলো, তারা এসে খবর দিলো যে একটা খালিবাসার দোতলার উপর দুই দারোয়ানের লাশ পাওয়া গেছে। যে চাবিগুলো তাদের সঙ্গে ছিলো তাও পাওয়া গেলো। সুতরাং লাশ যে তাদেরই তাতে আর সন্দেহ রইলো না। এবার আর এক সমস্যার সৃষ্টি হলো। এদের দাফনের ব্যবস্থা কিভাবে হবে? লাশ দু'টি এমনিভাবে গলে গিয়েছিলো যে মুসলমানী কায়দায় গোসল করিয়ে জানাজা করানো একেবারেই সম্ভব ছিলো না। তার উপর কিছুটা ভয়ে এবং কিছুটা দুর্গন্ধের কারণে কেউ আর সেখানে যেতে চাচ্ছিলো না। তখন বাধ্য হয়ে কয়েকজন চাপরাশিকে ভয় দেখাতে হলো যে তারা যদি সহযোগিতা না করে ওদের আর্মির কাছে ধরিয়ে দেবো। এবার তারা রাজী হলো। পাঁচ-ছটা সাদা চাদর আমার বাসা থেকে ওদের হাতে দেওয়া হলো। বাসার সামনে একটি বড় কবর খুঁড়ে চাদর দিয়ে লাশ সাপটে দাফন করার নির্দেশ দিলাম। দাফন করার পর বলে দিলাম জানাজার দোয়া যেনো কবরের উপর পাঠ করা হয়। সে জন্য ক্যাম্পাসের এক ইমাম সাহেবকে পাঠানো হলো, যে অফিসার ঐ লোক



দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এ হত্যাকান্ডের জন্য তিনি কতটা দায়ী ছিলেন বলা মুশকিল, কিন্তু যাদের হাতে ওদের তিনি সঁপে দিয়েছিলেন তারা ওদের গাঁটের টাকার লোভে গুলী করে মেরে ফেলে। দু'জনের পকেটেই টাকা ছিলো বলে আমরা জানি।

তখন শুধু রাজশাহী ক্যাম্পাসেই নয় দেশের অন্যত্র আর্মির হাতে এ রকম হত্যাকান্ড প্রায়ই হচ্ছিলো। এর জন্য দায়িত্ব প্রধানতঃ সাধারণ সৈনিকদের, তারা বেপরোয়া হয়ে এ রকমের অনেক দুষ্কৃতি করে।

আর্মি এসে দু'একদিনের মধ্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহ আবার চালু করে। কিন্তু আমরা কলে পানি পাচ্ছিলাম না। কারণ পানির পাম্প কিভাবে চালাতে হয় আর্মির কেউ জানতো না। তারা এসে আমাকে একটা ব্যবস্থা করতে বললো। পাম্পের লোকজন কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলো, কেউ জানতো না। খবর পেলাম, এ খবর নাকি ডক্টর আহমদ হোসেনের জানা ছিলো। চরম গোলযোগের সময় মেহেরচন্ডি নামে যে গ্রামে তিনি মাঝে মাঝে রাত কাটাতেন, পাম্পের লোকগুলি সে গ্রামের অধিবাসী। তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। তাঁর দৌত্য সাফল্য মণ্ডিত হলো। তিনি মেশিনের লোক দু'জনকে ফিরিয়ে আনতে পারলেন। আমি তাদের আশ্বাস দিলাম যে তারা নির্ভয়ে কাজ করতে পারে। তারা অনায়াসেই মেশিন চালু করে ফেললো। আর্মির এক জমাদার উল্লাসে আমার কাছে এসে হাজির। বললো, 'চালিয়ে আপভি দেখেঙ্গে।' ইবনে আহমদকে সঙ্গে নিয়ে ওদের জিপে চড়েই সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি আহমদ হোসেন সাহেব বসা। মেশিন চালু হয়েছে, সৈন্যরা উল্লাস করছে।

## আর্মির নির্বুদ্ধিতা

হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। দু'জন সৈন্য মাঠ থেকে এক গরীব বেচারাকে ধরে এনে জমাদারের সামনে হাজির করে বললো, ইয়ে জাসুস হ্যায়, পাকড়া গিয়া হ্যায়। আর কোনো কথা নেই, জমাদার হুকুম দিলো, 'জাসুসটিকে অবিলম্বে গুলী করো'। লোকটির মুখ তখন বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে ভয়ে কাঁপছে। আমি জওয়ানদেরকে বললাম এ একটি গরীব মানুষ, কোনো কাজে হয়ত মাঠে বেরিয়েছিলো। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললো যে সে তার বোনের সন্ধানে মাঠে বেরিয়েছিলো। এমন আজগবি জবাব যে ওদের সন্দেহ আরো বেড়ে গেলো। প্রকান্ড খোলা মাঠে কোথায় মেয়ে থাকবে। আমি এবার বললাম, তুমি কোনো সূরা শুনিয়ে দাও যাতে এদের বিশ্বাস হয় যে তুমি মুসলমান। একে লোকটি ছিলো একেবারেই নিরক্ষর তারপর ভয়ে তার মুখ থেকে কোনো সূরাই বেরুলো না। যে শব্দ বেরুলো তাতে ওদের দৃঢ় ধারণা হলো যে লোকটি অবশ্যই অমুসলমান। তখন জমাদারকে

বললাম যে তুমি ওকে আড়ালে নিয়ে কাপড় খুলে পরীক্ষা করে দেখতে পারো যে সে সত্যই মুসলমান। কিন্তু এই পরীক্ষার পরও জমাদারের মনে এ বিশ্বাস রয়ে গেলো যে লোকটি মুসলমান বা হিন্দু যাই হোক, অবশ্যই জাসুস বা গুপ্তচর। তার ইঙ্গিতে সৈন্যরা মেশিন ঘরের আড়ালে নিয়ে তাকে গুলী করতে উদ্যত হলো। জীবনে এ রকমের অভিজ্ঞতা আমার কখনই হয়নি। চোখের সামনে কাউকে গুলী খেয়ে মরতে দেখিনি। আমি বারবার জমাদারকে বললাম লোকটি অত্যন্ত গরীব, একেবারে নিরক্ষর, ভয়ে ওর মুখে কথা সরছে না, জাসুসী করার মতো বুদ্ধিও তার নেই, ওকে মেরে তোমাদের কি লাভ হবে? সৌভাগ্যক্রমে জমাদার শেষ মুহূর্তে তার হুকুম প্রত্যাহার করে নিলো। আমি এবং ইবনে আহমদ ও ডক্টর আহমদ হোসেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। লোকটিকে শাসিয়ে বললাম 'আহম্মক, চারদিকে কারফিউ, এর মধ্যে তুই ঘর থেকে বেরিয়েছিস কোনো?' সে কোনো কথা বলতে পারলো না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বিনোদপুর গ্রামের দিকে চলে গেলো।

পনেরো বা ষোলো তারিখে ম্যাথমেটিক্সের প্রফেসর হাবিবুর রহমান-এর স্ত্রী আমার কাছে এসে কেঁদে ফেললেন। বললেন যে তাঁর স্বামীকে আর্মি ধরে নিয়ে গেছে। এবং তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। শোনা গেলো বাংলা বিভাগের বরিশাল নিবাসী এক শিক্ষককেও ওরা ধরে নিয়ে গেছে। শুনলাম, আর্মির লোকজনরা হাবিবুর রহমান সাহেবের বাসার উল্টো দিকের বাড়ীর তালা যখন ভাংতে যায় তখন তিনি প্রতিবাদ করতে বেরিয়েছিলেন। খবর শোনা মাত্র আমি ও ইবনে আহমদ আবার জুবেরী হাউজে গেলাম। অফিসারদের জিজ্ঞাসা করলাম শিক্ষকদ্বয়ের কথা। ওঁরা বললেন এঁদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ। এঁদের ওঁরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবং তাঁরা শিগ্‌গিরই ফিরে আসবেন। সাময়িকভাবে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। দু'দিন পর আবার খোঁজ করতে বেরুলাম, তখনও পেলাম একই উত্তর। আর্মির তরফ থেকে বলা হলো এঁদের কোনো শাস্তি দেয়া হয়নি। কিন্তু আমার মনে একটা আশঙ্কা ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু অফিসারদের আশ্বাসের পরও কিভাবে বিশ্বাস করবো যে ওদের গুলী করা হয়েছে? কয়েকদিন পর অবশ্য কাজলার এক ডোবার পারে একজনের চশমা ও আরেক জনের পায়ের স্যান্ডেল পাওয়া যায়। তখন আর সন্দেহ রইলো না এদের ভাগ্যে কি হয়েছে। খুব মর্মাহত হলাম। প্রফেসর হাবিবুর রহমানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ১৯৪৪ সাল থেকে কোলকাতায়। তিনি তখন এম এন রায়ের ভক্ত ছিলেন। মানুষ হিসেবে ছিলেন অমায়িক এবং অনেকের মুখে অঙ্ক শাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্যের কথা শুনেছি। তিনি কোনো রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন না। ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে যাননি। এভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটবে কল্পনাও করতে পারিনি।

বাংলার শিক্ষকটির কাহিনী আরো করুণ। সুখরঞ্জন সমাদ্দার যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তখন থেকে তাকে চিনতাম। তাঁর বাড়ী ছিলো বরিশালে। আমার



পরিষ্কার মনে আছে যে ১৩ই এপ্রিলের আগে গোলযোগের মধ্যে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। আমিই তাকে বলেছিলাম যে দেশের অবস্থা যে মোড় নিয়েছে তাতে তার বোধ হয় ইন্ডিয়ায় চলে যাওয়াই নিরাপদ হবে। কারণ, আমি বললাম; বর্তমানে আর্মি আওয়ামী লীগারদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ক্ষিপ্ত। তারা বাছবিচার না করে অনেককেই গুলী করছে। তাকে কিভাবে আমি এ আশ্বাস দেবো যে তার কোনো বিপদ হবে না। এর জবাবে যে কথা সে বললো তা শুনে একদিকে যেমন অভিভূত হয়েছিলাম অন্যদিকে বিস্মিতও হয়েছিলাম। সে বলেছিলো সে পূর্ব বঙ্গের লোক। পাকিস্তানে স্বচ্ছন্দে আছে, ভয়ে ইন্ডিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ তাঁর নেই। নিরাপরাধ লোককে আর্মি খুন করবে-এ কথা সে বিশ্বাস করে না। তবু আমি তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম, এ রকম ঝুঁকি যেনো সে গ্রহণ না করে।

## কেরানীর ঘটনা

চৌদ্দই এপ্রিলের আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। সেদিন দুপুরের দিকে আমার অফিসের এক কেরানী, লোকটি ২৫ মার্চের পরই পালিয়ে যায়। কোথায় ছিলো আমরা জানি না। সে যে কাহিনী বললো তা বিস্ময়কর। বললো যে, যখন তারা শুনতে পেলো যে নগরবাড়ী থেকে পাকিস্তান আর্মি ক্রমান্বয়ে রাজশাহীর দিকে এগিয়ে আসছে তখন সে অন্যত্র আত্মগোপন করার কথা ভাবে। একটি ট্রাক ভাড়া করে সপরিবারে যাত্রা করে। এটা ১২ই এপ্রিলের ঘটনা। তার এমনই নসিব তাদের ট্রাকটি পাকিস্তান আর্মির মুখোমুখি এসে পড়ে। ট্রাক চালক অবিলম্বে ছুটে উধাও হয়ে যায়। এ বেচারা তখন একেবারেই অসহায়। ভাবলো, পলায়নরত অবস্থায় পেলে আর্মি সঙ্গে সঙ্গে ওদের গুলী করে মারবে। তখন তার করণীয় কিছুই ছিলো না। পরিবারকে ফেলে পালাতেও পারছিলো না। এ সময়েই আর্মির একটি গাড়ি তার ট্রাকের সামনে এসে পড়ে। লোকটির তখন বেহুঁশ হওয়ার মতো অবস্থা। গাড়িতে পাকিস্তান আর্মির যে অফিসারটি ছিলেন তিনি সব কথা শুনে বললেন, তুম লোগ হামারে সাথ আও। সে ভাবলো কিছুদূর নিয়েই হয়তো তারা তাকে গুলী করবে। সে জানালো ট্রাক চালাবার ক্ষমতা তার নেই। তখন এক আর্মি ড্রাইভারকে ট্রাক চালাবার কাজে নিয়োগ করা হয়। এবং সপরিবারে কেরানী আর্মির এই কলামের সঙ্গে আবার রাজশাহী অভিমুখে যাত্রা করে। যে কলামটি ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছিলো তার সঙ্গে দ্বিতীয় কলামের যোগাযোগ ছিল না। যে অফিসারের হাতে এরা বন্দী হয়েছিলো সে জানতো যে বাংগালীরা রুটি খেতে চায় না। তাই এদের জন্য আলাদা করে ভাত রান্নার ব্যবস্থা করা হয়।

কলাম ধীরে ধীরে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হয়। ১২ তারিখের রাত্র তারা রাস্তার ধারে এক কলেজে কাটায়। এরা মোটেই জানতো না যে পূর্ববর্তী কলামটি ইতিমধ্যেই ক্যাম্পাসে উপনীত হয়েছে। ওদের ধারণা ছিলো যে ক্যাম্পাস তখনো বিদ্রোহী বাহিনীর দখলে। কেরানী নিজের পরিচয় দিয়ে জানায় যে সে ইউনিভার্সিটির কর্মচারী। ক্যাম্পাসে পৌঁছে দিলেই সে আপাততঃ রক্ষা পাবে। কিন্তু ক্যাম্পাসে ঢুকবার হুকুম দ্বিতীয় কলামের ছিলো না। তারা নতুন করে পথে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চাচ্ছিলো না। ফল হলো এই যে কেরানীটিকে সপরিবারে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকের সামনে রেখে ওরা দ্রুত গতিতে চলে যায়। ফটক থেকে আমার বাসা ছিলো প্রায় সিকি মাইল দূরে। বলা বোধ হয় প্রয়োজন যে ক্যাম্পাসে এই কেরানীটির কোনো কোয়ার্টার ছিলো না। সে ভাবলো, ভাইস চান্সেলরের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়াই শ্রেয়। কিন্তু বুড়ো মা, স্ত্রী এবং ছোট বাচ্চাদের নিয়ে এদ্দুর পথ পায়ে হেঁটে কিভাবে আসবে। ওদের গেইটে বসিয়ে আমার কাছে এসেছিলো সাহায্যের জন্য। সে তো কেঁদেই অস্থির। আমি খোঁজ করে একজন ড্রাইভার পাঠিয়ে ওদের বাসায় আনার ব্যবস্থা করি। ওরা বেশ কিছুদিন নীচের অফিস সংলগ্ন এক কামরায় বাস করে।

## ১৪ই এপ্রিল

১৩ তারিখ রাত্রে আর্মি ক্যাম্পাস থেকে আর বেশী দূর যায়নি। ১৪ তারিখে খুব ভোরে ওরা রাজশাহী শহরে প্রবেশ করে। ক্যাম্পাস থেকে শহরের দূরত্ব তিন মাইলের মতো। পরে শুনলাম তখন কতগুলো লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। সারা রাজশাহী বিদ্রোহীদের দখলে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আর্মি গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে অগ্রসর হয় এবং শহরে ঢুকে রাজশাহীর বিখ্যাত বিপণী কেন্দ্র সাহেব বাজারে আগুন ধরিয়ে দেয়। এখানে বহু দোকান-পাট ছিলো, মালামাল ছিলো কয়েক কোটি টাকার। সব একবারে ভস্মীভূত হয়ে যায়। লোক ক'জন হতাহত হয়েছিলো তার হদিস আমরা পাইনি, কিন্তু একটি মর্মান্তিক ঘটনায় হৃদয় বিশেষভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমারই এক প্রাক্তন ছাত্র আবদুস সাত্তার রাজশাহীতে বাস করতো। সে ছিলো একটি বিখ্যাত ইন্সুরেন্স কোম্পানীর প্রতিনিধি, খুব ধর্মভীরু এবং সরল। ১২ তারিখে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলো। আমি তাকে ক্যাম্পাসের কোনো খালি বাসায় এসে আশ্রয় নিতে বলেছিলাম। সে বলেছিলো, 'স্যার, আমি যেখানে আছি সে বাসা মোটামুটি নিরাপদ।' চৌদ্দ তারিখের পর আবদুস সাত্তারের কোনো সন্ধান না পেয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। কিন্তু কি হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল না। ডক্টর আবদুল বারী ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু। তিনি ১৫ বা ১৬ তারিখে ক্যাম্পাসে ফিরে এসে আবদুস সাত্তারকে খোঁজাখুঁজি করেন। টুকরো খবর যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিলো তা থেকে এ তথ্য উদ্ধার করা গেছে যে ১৪ তারিখের ভোরে আবদুস সাত্তার এবং তাঁর দুই কিশোর পুত্রকে গুলী করা হয়।



কারণ আর্মি যখন শহরে প্রবেশ করছে তখন বাইরের দু'জন লোক আবদুস সাত্তারের বাসার ছাদের উপর থেকে বাইনোকুলার দিয়ে আর্মির গতিবিধি লক্ষ্য করছিলো। এই লোকগুলোকে আবদুস সাত্তারই নাকি দু'একদিন আগে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বাইনোকুলার দেখে আর্মির স্থির বিশ্বাস হয় যে ছাদের লোকগুলো অবশ্যই স্নাইপার। তারা হুড়মুড় করে আবদুস সাত্তারের বাড়ীতে ঢোকে। ছাদের লোক দু'টি তখন পালিয়ে গেছে। পাওয়া গেলো আবদুস সাত্তারকে। আর্মি আর কোনো কথা না বলে আবদুস সাত্তার ও তাঁর ছেলেদের নিয়ে গুলী করে। শোনা যায়, এই আকস্মিক আক্রমণে আবদুস সাত্তার এতটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলো যে সে কোনো কথাই বলতে পারেনি।

## ডক্টর আবদুর রকিব

এর পরের সমস্যা সৃষ্টি হলো ডক্টর আবদুর রকিবকে নিয়ে। আমি আগেই বলেছি তিনি ১৩ই এপ্রিল ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যদের মতো তিনিও পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয় নেন। আর্মি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে অনুপস্থিত শিক্ষক এবং কর্মচারী কে কোথায় আছেন তার সন্ধান করে। তারা শুনেছিলো যে রকিব সাহেব ইন্ডিয়াতে রয়েছেন। আশেপাশের গ্রামে যাঁরা পালিয়েছিলেন তাঁরা দু'একজন করে ফিরে আসতে শুরু করেন, কিন্তু যারা পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন যেমন ডক্টর মাযহারুল ইসলাম, ডক্টর আবদুল মান্নান এরা কেউ প্রত্যাবর্তন করেননি। প্রত্যাবর্তন করার পরামর্শও আমরা কেউ দিতাম না। কিন্তু একদিন হঠাৎ দেখি ডক্টর আবদুর রকিব আমার বাসায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে দেখে আমি তো একবারে নির্বাক। আমার মনে হচ্ছিলো আমি এক মৃত ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে আছি। প্রশ্ন করলাম আমাকে না জিজ্ঞাসা করে আপনি ইন্ডিয়া থেকে ফিরে এলেন কোনো? আপনি কি জানেন যে যারা ইন্ডিয়া আশ্রয় নিয়েছে তাদের উপর আর্মি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। জবাবে ডক্টর আবদুর রকিব জানালেন যে তিনি স্বকর্ণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এমনেস্টি ঘোষণার কথা শুনেছিলেন। তাই তিনি মনে করেছেন আর কোন বিপদ নেই। আমি বললাম, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা হয়ে থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে কারো শাস্তি হবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? আর্মি ইউনিভার্সিটির পলাতক শিক্ষকবৃন্দ সম্পর্কে নানা কথা শুনেছে। তারা মনে করে এই শিক্ষকরা ইন্ডিয়ান কলাবোরেটর। মনে হলো ডক্টর আবদুর রকিব তখনো তাঁর বিপদ সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ হননি। কিন্তু আমার ভয় ছিলো, আর্মি তাঁকে গ্রেফতার করবে। তাঁকে শুধু বললাম, সম্ভব হলে আপনি আবার ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যান। তিনি শুধু বললেন, আমি এখন কোথায় যাবো-? এই বলে তিনি বিদায় নিলেন।

আমি পড়লাম মহাসংকটে, এই লোকটির প্রাণ রক্ষা করার উপায় কি। রেজিস্টার

জোয়ারদার সাহেবকে খবর দিয়ে তাঁকে ঘটনাটা বললাম। তিনিও চমকিত হয়ে উঠলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন ডক্টর আবদুর রকিবের বন্ধু আমানউল্লাহ আহমদকে ডেকে অনুরোধ করতে পারেন। তাঁরা যেনো কৌশলে রকিব সাহেবকে আত্মগোপন করতে সাহায্য করেন। আমান উল্লাহ্ ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক, আমার প্রাক্তন ছাত্র। খবর দেওয়া মাত্র সে এলো। যখন বললাম, যে ডক্টর রকিব ফিরে এসেছেন এবং আমার আশঙ্কা যে তাঁকে লুকোতে না পারলে আর্মি খুব সম্ভব তাঁকে গ্রেফতার করবে, তখন সে বেশ ভীত হয়ে পড়লো। বললো, 'স্যার, আমি এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে চাই না'। তার উপর চাপ দেয়ার অধিকার আমার ছিলো না। অন্যদিকে আমার নিজের বাসায় যে রকিব সাহেবকে রাখবো তারও উপায় ছিলো না। কারণ এ বাসার চারদিকে আর্মির পাহারা ছিলো। আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়লাম। কারণ ডক্টর রকিবের আর এমন কোনো বন্ধু ছিলো না যে তাঁর জন্য কোনো ঝুঁকি গ্রহণ করবে।

অবশ্য তাঁকে কোথায়ও সরানো সম্ভব হতো কিনা, সন্দেহ। ক্যাম্পাসে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে তাঁর উপর আর্মির নজর ছিলো। আমরা অসহায়ের মতো পরবর্তী ঘটনার অপেক্ষা করে রইলাম–গ্রীক নাটকে নায়ক যেমন নিয়তির লিখন জেনেও তা খন্ডাতে অসমর্থ হয় এ যেনো তেমনি একটি ব্যাপার। সত্যি সত্যি সেদিন রাত এগারটায় আর্মি তাঁকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে গেলো। আমি জানতে পেরে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উৎকণ্ঠায় রাত কাটালাম। ডক্টর মতিয়র রহমান ছিলেন আর্মির সঙ্গে আমাদের লিয়াজোঁ অফিসার। তিনি পরদিন সকালে খবর নিয়ে এলেন যে ডক্টর রকিবকে জুবেরী হাউজে আটক রাখা হয়েছে। ইনটারোগেশনের পর তাঁর বিচার হবে। কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া গেলো। এখন একমাত্র ভরসা যে যদি আর্মিকে বুঝাতে পারি যে ডক্টর রকিব খুন, জখম, লুট এ সমস্ত অপকর্ম কোনোটিই করেননি শুধু ভয়ে ইন্ডিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। তা হলে হয়তো তাঁর প্রাণ রক্ষা পাবে। ডক্টর মতিয়র রহমানের মারফত আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা গেলো। তারা জানালো যে আমাকে না জানিয়ে তারা কোনো কিছুই করবে না। এখন শুধু ইনটারোগেশন হচ্ছে। দু' একদিন ইনটারোগেশনে তারা আমাকে জানালো যে তাদের স্থির বিশ্বাস যে ডক্টর রকিব বিদ্রোহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে তারা লিখিতভাবে আমার মতামত দেখতে চায়। এ সময়ে বোধ হয় কর্ণেল তাজের বদলে কর্ণেল রিজবী বলে আর এক অফিসার ক্যাম্পাসের ভার নিয়েছিলেন, তিনি বেশ শিক্ষিত লোক ছিলেন। সে জন্য আশা হলো যে গরম মাথায় একটা কিছু করবেন না। আমার লিখিত রিপোর্ট–এ আমি বললাম যে গত তিন চার মাসে গোলযোগের মধ্যে বিভিন্ন রকম চাপে আমরা অনেকে অনেক কিছু করেছি। আমার নিজের বাসায় কালো ফ্ল্যাগ ওড়াতে বাধ্য হয়েছি। এ রকম অপরাধে যদি বাংগালীদের শাস্তি দেওয়া হয় তা হলে আমাদের সবারই মৃত্যুদন্ড হবে। আমি তাই সুপারিশ করলাম যে অবিলম্বে যেনো ডক্টর রকিবকে খালাস করে দেওয়া হয়। যদ্দুর মনে পড়ে তাকে ওরা সাতদিন আটক রেখেছিলো। মুক্ত হওয়ার পর এবারো তিনি সাক্ষাৎ করতে এলেন। একটু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, যে বিপদের হাত থেকে



তিনি রক্ষা পেয়েছেন তার গুরুত্ব সম্পর্কে তখনো তাঁর মনে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিলো না। ডক্টর মতিয়ার রহমান আপ্রাণ চেষ্টা না করলে যে তাকে বাঁচানো সম্ভব হতো না –এ কথা তাঁকে বলেছিলাম। এর পর অবশ্য তাঁর আর কোনো বিপদ হয় নাই।

## গুজব ও খবর

দেশের অন্যত্র কি হচ্ছে তার বিস্তারিত খবর আর্মির কাছ থেকেও পাচ্ছিলাম না। তারা শুধু বলত যে, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি প্রায় সর্বত্র তাদের কর্তৃত্ব পুরো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টুকরো খবর যা পেয়েছিলাম তাতে জানা গেলো যে পাবনার ডিসি নূরুল কাদের খান বহু টাকা–পয়সা ও মালামাল নিয়ে ইন্ডিয়ায় চলে গেছেন। নূরুল কাদেরকে আমি চিনতাম। সে যখন ঢাকা ইউনির্ভাসিটির ছাত্র তখন মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতো। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছাত্র না হলেও ভালো ইংরেজী বলতে পারে বলে তার একটা গর্ব ছিলো। এ রকমের একজন তরুণ দেশোদ্ধারের নামে ট্রেজারির টাকা–পয়সা নিয়ে গেছে শুনে দুঃখ পেয়েছিলাম বৈকি। উত্তর বঙ্গের রংপুরের ডিসি ছিলো সৈয়দ শামিম আহসান। সে আমার ফুপাতো ভাইয়ের ছেলে। তার কি হলো সে খবর উদ্ধারের অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সঠিক সংবাদ কেউ দিতে পারেনি। কেউ বলেছিলো সে আওয়ামীদের হাতে বন্দী আবার কেউ খবর দিয়েছিলো যে আর্মি তাকে মেরে ফেলেছে।

আর এক খবর অর্থাৎ গুজব কানে এলো। শুনলাম চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলর ডক্টর এ আর মল্লিক ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক সমভিব্যহারে আগরতলা চলে গেছেন। এর মধ্যে নাকি বাংলা বিভাগের সৈয়দ আলী আহসান ও ডক্টর আনিসুজ্জামানও ছিলো। গুজবটি যে সত্য সেটা অনেক পরে জানতে পারি। এমনকি মে মাসে আমি যখন ঢাকা আসি তখনও আলী আহসানের পরিবারের লোকেরা নিশ্চিতভাবে কোন খবর দিতে পারেনি। পরে অবশ্য নিজের কানেই কোলকাতা রেডিও থেকে আলী আহসানের গলার আওয়াজ শুনেছিলাম। আলী আহসান ছাত্র জীবনে আমাদের সঙ্গেই পাকিস্তান আন্দোলন করেছে। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সে ছিলো প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী। '৪৭ সালের পর সেই বলেছিলো যে দরকার হলে পাকিস্তানের স্থায়িত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথকেও বর্জন করতে হবে। আইয়ুব খানের আত্মজীবনীর বাংলা অনুবাদও সে করে। কিন্তু ইতিহাসের কি অদ্ভুত পরিহাস এ ধরনের লোকরাই পাকিস্তান বিরোধী সংগ্রামে উৎসাহে নেতৃত্ব দিচ্ছিলো।

## ডক্টর মল্লিক

ডক্টর মল্লিকের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৩৬ সাল থেকে (বয়সে তিনি আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়)। আমার ফুপাতো ভাই সৈয়দ কামরুল আহসানের সহপাঠী ছিলেন।

সেই সূত্রে বহুবার ঢাকার হাসিনা মঞ্জিলে এসেছেন। আমিও তখন সে বাসায় থাকি। ওঁরা ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজে পড়তেন, আমি মেট্রিকুলেশন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। তিনি যখন চট্টগ্রামের ভাইস চান্সেলর তখনো তাঁর বাসায় গিয়েছি, পরিবারের সঙ্গেও মিশেছি। ১৯৬৯ বা ৭০ সালে এক কনফারেন্স উপলক্ষে ডক্টর মল্লিক রাজশাহী এসেছিলেন। বলা প্রয়োজন যে ভাইস চান্সেলর পদ গ্রহণ করার পূর্বে বহু বছর তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিছুকাল একটি হলের প্রভোস্টও ছিলেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের একটি ঘটনা বিশেষ করে মনে পড়ছে। আমরা লাহোরে গিয়েছিলাম পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের এক মিটিং-এ। একত্রিশে ডিসেম্বর ডক্টর মল্লিক, আমি এবং আমাদের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন অধ্যাপক আনারকলি বাজারে বেড়াতে বের হয়েছিলাম। একটা কাপড় বা কার্পেটের দোকানে ঢুকলাম। ওরা আমাদের পরিচয় পেতেই সাদর অভ্যর্থনা জানালো। দু'এক কথার পরই মাশরেকী পাকিস্তানের হাল হকিকতের কথা জিজ্ঞাসা করলো। ছে নুক্তা বা ছ' দফা নিয়ে আওয়ামী লীগ ইলেকশনে জয়লাভ করেছে বলে ওরা খুব শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো। দোকানের মালিক জিজ্ঞাসা করলো, আপনারা কি সত্যি পাকিস্তানকে টুকরো করে ফেলতে চান? আমাদের পক্ষ থেকে ডক্টর মল্লিক জবাব দিলেন। তিনি বললেন, ছ' দফার দাবী বিচ্ছিন্নতার দাবী নয়। শুধু অধিকতর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী। 'সব ঠিক হো জায়েগা'। এই জবাবে সে অর্ধ শিক্ষিত দোকানদার যে কথাগুলি বলে তা এখনো আমার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে। সে বলেছিলো, আমার শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষ নেই, রাজনীতি ভালো বুঝি না। শুনেছি পশ্চিম পাকিস্তান বিশ বছর ধরে মাশরেকী পাকিস্তানকে শোষণ করেছে বলে আমাদের উপর আপনাদের প্রচন্ড ক্ষোভ। যদি তাই হয়ে থাকে তবে দোহাই আপনাদের আগামী বিশ বছর আপনারা পাকিস্তানের ধন-রত্ন সব লুটে নিন, আপনারা যতো পদ আছে সব দখল করুন আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না, কিন্তু পাকিস্তানকে ধ্বংস করবেন না এই আমার আবেদন। আমি অতি সাধারণ ব্যক্তি আর কিছুই বুঝি না। শুধু বুঝি যে মুসলমান জনসাধারণের অসাধারণ ত্যাগের বিনিময়ে যে পাকিস্তান আমরা হাসিল করেছি তার ক্ষতি হোক এমন যেনো কিছু না হয়। ডক্টর মল্লিক আবার তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, সত্যি কোনো আশংকার হেতু নেই।

সৈয়দ কামরুল আহসান যাঁর নাম উপরে উল্লেখ করলাম, তিনি থাকতেন হবিগঞ্জে। ন্যাশনাল এসেম্বলিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। শোনা গেলো আওয়ামী বাহিনী তাঁকে হয় মেরে ফেলেছে অথবা ধরে করিমগঞ্জে নিয়ে গেছে। তাঁর বোন আমার স্ত্রী। স্বভাবতই এ খবরে গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। আমি ডক্টর মতিয়ুর রহমানকে অনুরোধ করলাম আর্মির মাধ্যমে তাঁর সন্ধান করা যায় কি-না। প্রথম কয়দিন কোনো



খবরই পাওয়া গেলো না। কয়েকসপ্তাহ পরে শুনলাম তিনি জীবিত আছেন এবং হবিগঞ্জেই রয়েছেন।

ঢাকার খবরও পাচ্ছিলাম না। শুধু শুনলাম, নাজিমুদ্দিন রোড ভস্মীভূত হয়ে গেছে সে খবর মিথ্যা। আমার পরিবারের সকলে ঢাকায় যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো। কিন্তু যাই কি করে? মিলিটারী কনভয়ের সঙ্গে না গেলে নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা ছিলো না। এবং মিলিটারী এ সময় আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাতায়াত করতে রাজী হলো না। বিপাকে পড়লাম। আমার সঙ্গে আমার পরিবারের লোকজন ছাড়া আমার দুই ভাতিজি ছিলো। নসরত ও তাহমিনা। তারা এসেছিলো বেড়াতে। এভাবে আটকা পড়বে স্বপ্নেও ভাবেনি। বয়স দু'জনেরই খুব কম। নসরতের বয়স ছিলো বোধ হয় ১৩/১৪ আর তাহমিনার ৯ বা ১০। এদের পরিবার নিশ্চয়ই খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলো। কিন্তু ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার কোনো উপায়ই পেলাম না।

ক্যাম্পাসে মিলিটারী বসায় প্রায় প্রতিদিনই দেখা যেতো কতগুলি লোককে দড়ি দিয়ে বেঁধে আনা হচ্ছে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে এদের গ্রেফতার করে আনা হতো। এবং ক্যাম্পাসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। কিন্তু এদের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটতো কখনো আমাদের বলা হয়নি।

একদিন রাত্রে সবাই শুয়ে আছি, রাত এগারটা কি বারোটা হবে, হঠাৎ এলো এক প্রচন্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ। সারা বিল্ডিং কেঁপে উঠলো। আমি ভাবলাম আবার বোধ হয় ক্যাম্পাসে লড়াই শুরু হয়েছে। কালবিলম্ব না করে সবাইকে নিয়ে আগের মতো নীচে বাথরুমে আশ্রয় নিলাম। ইবনে আহমদ তখন ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের বাসায় ফিরে গেছেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন আর কোনো শব্দ শোনা গেলো না তখন ভাবলাম বিদ্রোহীরা বোম ছুঁড়ে সম্ভবত পালিয়ে গেছে। শোবার ঘরে ফিরে এলাম। সকাল বেলা দেখা গেলো আমার নীচের তলার অফিস ঘরের কাঁচ ভাঙ্গা। ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হলো। কেউ কি এ বাসা আক্রমণ করেছিলো? খোঁজ নিয়ে জানা গেলো ওসব কিছুই হয়নি। রাত্রে আর্টস বিল্ডিং-এর সামনে ছাত্ররা যে শহীদ মিনার তৈরি করেছিলো আর্মি বারুদ দিয়ে তা উড়িয়ে দেয়। সেই আওয়াজে জানালার কাঁচ ভেঙ্গে যায়। বাসা থেকে বেরিয়ে দেখলাম মিনারের ভিতটা শুধু অবশিষ্ট।

একদিন সাহেব বাজার দেখতে গেলাম। সঙ্গে রেজিস্ট্রার জোয়ারদার সাহেবও ছিলেন। দোকানপাট সবই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তার মধ্যে পুরানো দোকানদাররা আবার ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। ওদের ক্ষতির পরিমাণ শুনলাম সত্যি কয়েক কোটি টাকার মতো। আরো শুনলাম, আর্মি এ অঞ্চল দখল করার পর কিছু কিছু দুষ্কৃতিকারী এসব দোকানে লুটতরাজ করে অবস্থা ঘোলাটে করে। এর মধ্যে বাংগালী বিহারী দু'দলের লোকই ছিলো। কিন্তু একাত্তর সালের সে আবহাওয়ায় দোষ বর্তায় সম্পূর্ণ বিহারীদের উপর। এতে বিহারী-বাংগালী সম্পর্ক আরো তিক্ত হয়ে ওঠে।

তার কয়েকদিন পরের কথা। শুনলাম শহরে কারফিউ জারী করা হয়েছে। হঠাৎ এই কারফিউ কেনো? আবার কি কোনো দাঙ্গা বেঁধে উঠলো? দু'দিন পর যখন কারফিউ তুলে নেয়া হলো তখন আসল খবর জানা গেলো। শুনলাম, যে দিন প্রথম কারফিউ জারী করা হয় সেদিন পাকশী, শান্তাহার এসব অঞ্চল থেকে আহত অনেক উর্দু ভাষী লোকজনকে ট্রেনে করে রাজশাহীতে নিয়ে আসা হয়। এদের মধ্যে অনেকেই বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছিলো; কারো হাত কাটা, পা কাটা, বুক কাটা, কান কাটা ইত্যাদি। আর্মি কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়েছিলেন যে আত্মীয়-স্বজনের এ অবস্থা দেখলে বিহারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে বাংগালীদের উপর প্রতিশোধ নিতে চাইবে। কারণ এমন বর্বরতা নেই যা এদের উপর করা হয়নি। এ রকম বর্বরতার কাহিনী আরো শুনতাম এবং লজ্জায়, ক্ষোভে এবং নৈরাশ্যে মাথা হেঁট হয়ে যেতো। দেশে কিসের লীলা আরম্ভ হয়েছে? তান্ডবের শেষ কোথায়? কতকগুলি ফাঁকা বুলির প্ররোচনায় আমরা কি পশুত্বে নেমে এসেছি?